সংবাদ

24 OCT 2013

‘অবৈতনিক’ বনাম ‘বিনামূল্যে’ প্রাথমিক শিক্ষা

খোন্দকার লুৎফুল খালেদ, ফারিয়া তিলাত লোবা ও তন্বী নওশীন

সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ‘প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ খরচ’ বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এ বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। কেননা, এসব দেশের অধিকাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। শিশুর শিক্ষালাভের সুযোগের সঙ্গে অভিভাবকের আর্থিক সক্ষমতা সরাসরি জড়িত। সেজন্যই বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু থাকলেও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নানারকম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ খরচের কারণে একই মানের প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রের সব শিশুর জন্য নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এর বিকল্প হিসেবে আলোচনায় আসছে বিনামূল্যে শিক্ষা অর্থাৎ কেবল বেতন নয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব ব্যয়ভারও রাষ্ট্র দ্বারা বহন করা। একই সঙ্গে বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি কার্যকর নাগরিক উদ্যোগ ও জন অংশগ্রহণের ভূমিকাও আলোচনা করা জরুরি। কেননা বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় জন অংশগ্রহণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত দেখে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও সর্বস্তরের মানুষের কাছে এর সুফল সমানভাবে পৌঁছাতে পারছে না। ফলে শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জন যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি রাষ্ট্রের নাগরিক বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার সার্বিক কল্যাণ থেকে।

বর্তমানে বহু প্রতীক্ষিত শিক্ষা আইন অনুমোদন ও কার্যকর করার প্রক্রিয়া চলছে। এর ফলে একদিকে যেমন প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য নিশ্চিত করার বিষয়টি অনেক ধাপ এগিয়ে গেছে তেমনি একে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক হিসেবে নিশ্চিত করার জন্য আইনটির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাই কার্যকর জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিনামূল্যে সব শিশুর জন্য একই মানের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিরাজমান আইন (১৯৯০-এর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন) ও নীতিমালাগুলোর (শিক্ষানীতি-২০১০) বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যাতে করে নতুন শিক্ষা আইনে সেই অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় এবং পরিবর্তিত আইনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থেই সব শিশুর জন্য শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করা যায়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০ এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা

১৯৯০ এর আইনের ২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘প্রত্যেক শিশুর অভিভাবক, তার শিশুকে, যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলে, প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় অবস্থিত তার বাসস্থানের নিকটস্থ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাবেন।’ তার মানে এ আইন অনুযায়ী সন্তানের শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়ভার মূলত বাবা-মার অর্থাৎ সরকার সচেতনভাবেই প্রধান দায়িত্ব বাহকের ভূমিকা থেকে সরে এসে তার জবাবদিহিতার জায়গাটি অস্বচ্ছ করে রেখেছে। এমনকি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে আইনে উল্লিখিত ‘শিক্ষা কমিটির’ পাশাপাশি অভিভাবকেরও শাস্তির বিধান দেয়া আছে। অথচ একটি রাষ্ট্রের নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রধান এবং একমাত্র কর্তৃপক্ষ হলো সরকার। তাই সরকার কোনভাবেই প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়ভার অন্য কোন পক্ষের ওপর চাপিয়ে দিতে বা দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারে না। অর্থাৎ শিক্ষা আইনে রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করার সুযোগ এবং প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা অতীতে করা হয়নি।

বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০-এর মাধ্যমে দেশের সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করেছে। ‘বিনামূল্য’ এবং ‘অবৈতনিক’ এর পার্থক্য শিক্ষায় সাধারণের প্রবেশগম্যতাকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা নিচের উদাহরণ থেকে আরও স্পষ্ট হবে।

১৯৯০-এর আইনের ন্যূনতম অঙ্গীকার হচ্ছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় কোন ‘ফি’ লাগবে না এবং ক্রমান্বয়ে সব স্তরে অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা হলো, প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর পেছনে এখনও পরিবারকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়। যদিও প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি ব্যয় এবং বরাদ্দ যেমন বেড়েছে; তেমনি বেড়েছে প্রাথমিক শিক্ষার পরিধিও। এডুকেশন ওয়াচ বাংলাদেশের শিক্ষা অধিকারের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা যাচাই বিষয়ক একটি গবেষণায় থেকে দেখা যায় ২০০৫ থেকে ২০১১ সালের ব্যবধানে প্রাথমিক শিক্ষায় পারিবারিক ব্যয়ের খাতসমূহে খরচ যেমন বেড়েছে; একইসঙ্গে নতুন নতুন ব্যয়ের খাত যুক্ত হয়েছে। ২০০৫ সালে মোট ব্যয়ের খাত ছিল ৮টি, ২০০৫ সালে ব্যয়ের মোট খাতের সংখ্যা বেড়ে ১৮-তে উন্নীত হয়েছে। ৬ বছরের ব্যবধানে এ বৃদ্ধির হার প্রায় ৩ গুণ। তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, গাইড বুক বা নোট বুকের মতো খরচ তালিকায় অপরিহার্য হিসেবে এসেছে; যা ব্যয় বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার মানকেও প্রভাবিত করে। ফলে পারিবারিক আয়ের তুলনায় শিক্ষা ব্যয়ের অনুপাত বেড়েছে। এ গবেষণা থেকে দেখা যায়, গ্রামভিত্তিক উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে যেখানে তাদের আয়ের শতকরা ৪.৪ ভাগ খরচ করতে হয় শিক্ষা খাতে, সেখানে চরম দরিদ্র পরিবারগুলোকে খরচ করতে হয় তার প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ শতকরা ৮.৪ ভাগ। শিক্ষা ব্যয়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের বেতন খাতে কোন ব্যয় না থাকলেও, অর্থাৎ শিক্ষা অবৈতনিক হলেও এখনও বিনামূল্য নয় দেখে দরিদ্র পরিবারগুলোতেই এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে শিক্ষাকে শুধু অবৈতনিক করে সবার সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়; সে কারণেই বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসা প্রয়োজন এবং নতুন শিক্ষা আইনের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি নির্দেশ করা অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষানীতি ২০১০ : অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে দায়বদ্ধ- বিহীন প্রায়োগিক নির্দেশনার অভাব নীতিমালা বা পলিসি বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল পথনির্দেশক বা দৃষ্টিভঙ্গি। কোন দেশের শিক্ষাবিষয়ক আইন সে দেশের শিক্ষাবিষয়ক নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রণীত হয়ে থাকে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ রাষ্ট্রের শিক্ষার নীতিগত তাগিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে সব নাগরিকের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে প্রতি ৯ জনের মধ্যে ৩ জন অতিদরিদ্র সীমার নিচে বাস করে এবং শতকরা ৭৬ ভাগ মানুষ দৈনিক ২ ইউএস ডলার বা ১৬০ টাকার নিচে জীবন ব্যয় নির্বাহ করে সেদেশে সব মানুষের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি করা বলতে অবশ্যাম্ভাবীভাবে বোঝায় বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ। শুধু তাই নয়, শিক্ষা বিনামূল্যে করার পাশাপাশি শিশুদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার বাড়তি প্রণোদনা তৈরির দায়িত্বও রাষ্ট্রেরই অথচ শিক্ষা নীতিতেও এ ব্যাপারে আলোচনা শুধু ‘অবৈতনিক’ এ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

শিক্ষা নীতির প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অংশে বলা হয়েছে ‘...প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সবার জন্য একই মানের।’ কিন্তু এর পরপরই বলা হয়েছে- ‘কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা হবে।’ বাংলাদেশে সব শিশুর জন্য একই মানের শিক্ষা কেবলমাত্র একই ধারার শিক্ষা চালু করার মধ্য দিয়েই সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত যে ভিন্ন ভিন্ন ধারা তাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং সমাধান হিসেবে কেবলমাত্র কিছু মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি করার কথা বলা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ধারার শিক্ষার প্রচলন হয়েছে অভিভাবকদের চাহিদা ওপর ভিত্তি করে এবং এই চাহিদার পার্থক্য প্রধানত অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে হয়ে থাকে, কেননা এক একটি ধারার শিক্ষার খরচে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। যে কারণে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রধানত মাদ্রাসায় পড়তে দেখা যায় এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদের ইংরেজি মিডিয়ামে। একটি ধারায় বিশেষভাবে পারলৌকিক এবং ধার্মিক বিষয়াদির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং অন্যটিতে ইংরেজি ভাষা এবং ইউরোপিয়ান ইতিহাস ও কৃষ্টি। এমনিভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া চালু রেখে বিনামূল্যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য ‘রাষ্ট্রের সব শিশুর জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি করা’ তাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে।

শিক্ষানীতিতে শিক্ষায় জনসম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা খুবই সীমিত এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিতে কাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা যেমন স্পষ্ট করা নেই তার পাশাপাশি কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কমিটি কাজ করবে তাও অস্পষ্ট। বলা হয়েছে- ‘যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে নির্বাচিত ও পদাধিকারবলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য সংবলিত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিটিকে প্রয়োজনে আরও ক্ষমতা দেয়া হবে। তবে পাশাপাশি কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে’ এক্ষেত্রে ‘আরও ক্ষমতা’ বলতে কি নির্দেশ করা হচ্ছে এবং কিভাবে সেই ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করতে সহযোগিতা করবে তা বোঝা যাচ্ছে না; একইভাবে কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে তা আলোচনা করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়ে জন অংশগ্রহণের বেহাল অবস্থা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও ক্ষমতাশালী মহলের প্রভাবের বিষয়টি বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে সব স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে একটি ধারাবাহিক সচেতন নাগরিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সব শিশুর জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি শিক্ষা আইনে যেন যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় আর বাংলাদেশের শিক্ষা আইন যেন হয় দেশের সব নাগরিকের জন্য মানসম্মত শিক্ষা-অধিকার নিশ্চিত করার কার্যকর হাতিয়ার- এটাই প্রত্যাশা।